হুমায়ুন আজাদ

নারী

সাড়ে ৪ বছর নিষিদ্ধ থাকার পর প্রকাশিত

নারী

হুমায়ুন আজাদ

সাড়ে ৪ বছর নিষিদ্ধ থাকার পর প্রকাশিত

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

নারী

সাড়ে ৪ বছর
নিষিদ্ধ
থাকার পর
প্রকাশিত

হুমায়ুন আজাদ

নিষিদ্ধ *নারী* মুক্ত *নারী*

নারী প্রথম বই আকারে বেরিয়েছিলো ১৯৯২-এর ফেব্রুয়ারির বইমেলায়। বেরোতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিলো, এবং মেলার শেষ দিকে বেরোতে-না-বেরোতেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো প্রথম সংস্করণ। শুরু থেকেই *নারী* উপভোগ করে অশেষ জনপ্রিয়তা, এবং প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় বদ্ধ প্রথাগতদের, ও উল্লসিত অনুপ্রাণিত করে ভবিষ্যৎমুখিদের। বইটি অল্প সময়েই বদলে দেয় নারী সম্পর্কে প্রথাগত ধারণা। তখনও অনেক বাকি ছিলো লেখার, সংস্করণপরম্পরায় আমি যোগ করতে থাকি নতুন নতুন বিষয়; বেরোতে থাকে একের পর এক পুনর্মুদ্রণ। *নারী* নন্দিত হয়েছিলো ব্যাপকভাবে, এবং হয়ে উঠেছিলো মৌলবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্য। আমিও লক্ষ্য হয়ে উঠি আক্রমণের। প্রকাশের তিন বছর পর জানতে পারি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বইটি নিষিদ্ধ করার, তারপর অনেক দিন কিছু শুনি নি; হঠাৎ ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫-এ আমার অনুজ টেলিফোনে জানায় যে *নারী* নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী সরকার তখন বিপন্ন, তাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে, চলছে তীব্র আন্দোলন; পতনের আগে তাড়াহুড়ো ক'রে তারা নিষিদ্ধ ক'রে যায় বইটি। বইটিকে যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারি পরদিন পত্রিকা প'ড়ে। *নারী* নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে দেশেবিদেশে প্রতিবাদ হয়েছিলো, কিন্তু প্রতিবাদে আমাদের কোনো সরকারই বিচলিত হয় না, অটলতায় তারা অদ্বিতীয়। *বাংলাবাজার পত্রিকা* প্রথম পাতায় প্রকাশ করে দীর্ঘ প্রতিবেদন, যার শিরোনাম ছিলো 'নারী বাজেয়াপ্ত, লেখক হুমায়ুন আজাদ বললেন আমার হাসি পেয়েছে, একদিন ওরাই অনুতপ্ত হবে'; বিভিন্ন পত্রিকায় বেরোতে থাকে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়। *সংবাদ*-এ সম্পাদকীয় বেরোয় 'নারী', *ডেইলি স্টার*-এ সম্পাদকীয় বেরোয় 'এ ফুলিশ ব্যান'; আমেরিকার 'উইমেন্স ওয়ার্ল্ড' দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে 'ঢাকা ব্যান্স হুমায়ুন আজাদস নারী' নামে। এমন বহু সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় বেরিয়ে জানায় যে বইটির নিষিদ্ধকরণ তাঁরা মেনে নেন নি। বিবেকের কাছে আমাদের কোনো সরকার কখনো পরাস্ত হয় নি; জাতীয়তাবাদীরাও হয় নি।

নারী নিষিদ্ধ করা কি ঠিক হয়েছে?– আমার মনে প্রশ্ন জাগে। আমি বিনোদনকারী নই; আমার অনেক কিছুই আপত্তিকর প্রথাগতদের কাছে; আমি তো কিছুই মেনে নিই নি, যা তাদের পুজোর বিষয়। আমার সব বইই কি নিষিদ্ধ হ'তে পারে না? কিন্তু প্রকৃত বইকে কেউ নিষিদ্ধ ক'রে রাখতে পারে না; যারা নিষিদ্ধ করে, তারা ধ্বংস হয়, বেঁচে থাকে বই। এ-পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়েছে যতো প্রকৃত বই, সেগুলোর কোনোটিই লুপ্ত হয়ে যায় নি, আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে; দেখিয়ে দিয়েছে যারা নিষিদ্ধ করেছে, তারাই ছিলো ভ্রান্ত। কী অপরাধে নিষিদ্ধ করেছে বইটি? সরকার আমাকে কিছুই জানায় নি; তাই আমি দু-একজন অনুরাগীকে দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করি। কাগজপত্র পেয়ে আমি বেদনার্ত হই; দেখি *নারী* নিষিদ্ধকরণের আদেশ

প্রচারিত হয়েছে একজন সহকারী সচিবের স্বাক্ষরে, যে নারী। আদেশে বলা হয়েছে 'পুস্তকটিতে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি তথা মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী আপত্তিকর বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ৯৯ "ক" ধারার ক্ষমতা বলে বর্ণিত পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত হইল...।' সাথে দু-পাতার একটি সুপারিশ, যা করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দুটি বিশেষজ্ঞ– একটি দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের, আরেকটি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির পরিচালক;– তারা এ-বিশাল বইটি থেকে ১৪টি বাক্য উদ্ধৃত ক'রে পরামর্শ দিয়েছে : 'উপরোক্ত উদ্ধৃতি ও মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বইটি বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করা যায়।' এতো বড়ো বইটি পড়ার শক্তি ওই দুই মৌলবাদীর ছিলো না; তারা বইটি থেকে কয়েকটি বাক্য তুলে পরামর্শ দেয় নিষিদ্ধ করার। ওইগুলোর মধ্যে রয়েছে– 'নারীর প্রধান শত্রু এখন মৌলবাদ', '১৯৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে সৌদি আরবের মতো আদিম পিতৃতন্ত্রও নারীদের ঘর থেকে বের ক'রে লাগিয়েছে নানা কাজে' ধরনের বাক্য। *নারী*র নিষিদ্ধকরণ আমি মেনে নিই নি, বইটি নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫-এ আবেদন করি উচ্চবিচারালয়ে; আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, ইদ্রিসুর রহমান, ব্যারিস্টার তানিয়া আমির, শিরীন শারমিন চৌধুরী। বইটি নিষিদ্ধকরণ আদেশকে কেনো অবৈধ ব'লে গণ্য করা হবে না, ৭ দিনের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর জন্যে স্বরাষ্ট্র ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আরো দুজনকে নির্দেশ দেয় উচ্চবিচারালয়। বামন কুৎসিত মৌলবাদী একটি লোক আমার সাথে দেখা করে, সে জানায় তারই আবেদনে নিষিদ্ধ হয়েছে *নারী*; আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর কেটে যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর; কিছুই শোনা যায় না, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, মামলার কথা প্রায় ভুলে যাই।

২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০-এ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এক ডিভিশন বেঞ্চে *নারী*র মামলাটি গ্রহণ করার আবেদন করেন; তাঁর আবেদন গৃহীত হয়ে যায়। আমি কৃতজ্ঞ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের কাছে। আমি জানতামও না তিনি আবেদন করেছেন, পরের দিন জানতে পারি; তারপর দ্রুত এগোয় মামলাটি; ৭ মার্চ ২০০০-এ দুজন বিচারপতি রায় দেন যে *নারী* নিষিদ্ধকরণ আদেশ অবৈধ। আমি উপস্থিত ছিলাম, প্রথম বুঝতে পারি নি যে একটি ঐতিহাসিক রায় ঘোষিত হয়ে গেছে। যখন বুঝতে পারি তখন উল্লসিত হয়ে উঠতে পারি নি, আমি বেদনা বোধ করতে থাকি দেশের কথা ভেবে। এ কী বদ্ধ অন্ধ সমাজের লেখক আমি, যেখানে অবৈধভাবে একটি বই নিষিদ্ধ হয়ে থাকে বছরের পর বছর। এটি যে একটি ঐতিহাসিক যুগান্তরকারী রায়, তা বুঝতে পারে নি আমাদের পত্রিকাগুলোও; পরের দিন দেখি তারা মেতে আছে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে, চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশের আমাদের রয়েছে যে-সাংবিধানিক অধিকার, যা মেনে চলছিলো না সরকারগুলো, আমাদের উচ্চবিচারালয় যে বক্তব্য প্রকাশের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তা বুঝে উঠতে পারেন নি তাঁরা। অশুভ তাঁরা বোঝেন, শুভ বোঝেন না। *নারী* সম্ভবত বাঙলাদেশে একমাত্র বই যেটি উচ্চবিচারালয়ের আদেশে পেয়েছে পুনপ্রকাশের অধিকার; এটি এক বিরাট ঘটনা– শুধু *নারী*র জন্যে নয়, বাঙলাদেশের

চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতার জন্যেও। কোনো মৌলিক লেখকই মেনে নিতে পারে না প্রথাগত বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত, নির্দেশ; তার কাজ ওসব বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নির্দেশ অতিক্রম ক'রে যাওয়া, যদিও আমাদের লেখকেরা প্রথাগত বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নির্দেশেই স্বস্তি বোধ করেন। রাষ্ট্রের উচিত নয় কোনো ভাবাদর্শ অধিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া; কেননা সমস্ত ভাবাদর্শই ভুল ও অচিরস্থায়ী। ধর্মানুভূতি এক বাজে কথা, এটা বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রমাণ সম্ভব নয়। রাষ্ট্র বিশ্বাস করতে পারে ভুতপ্রেতে, কিন্তু কোনো মননশীল মানুষের পক্ষে তা মেনে নেয়া অসম্ভব। পৃথিবী এখন যেসব বিশ্বাস পোষণ করে, তার সবই ভুল, কেননা সেগুলো পৌরাণিক; রাষ্ট্রগুলো আজো আমাদের পৌরাণিক জগতে বাস করতে বাধ্য করে। আমি পৌরাণিক সংস্কৃতি ও অসভ্যতা থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই; *নারী*র পাতায় পাতায় সেই অভিলাষ রয়েছে। অজস্র পাঠক অপেক্ষা ক'রে ছিলেন *নারী*র জন্যে; আমি সুখী যে বইটি আবার তাদের হাতে পৌঁছোলো।

১৪ই ফুলার রোড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা
৬ চৈত্র ১৪০৬ : ২০ মার্চ ২০০০

হুমায়ুন আজাদ

অবতরণিকা : তৃতীয় সংস্করণ

বিশশতকের শেষ দশকের মাঝামাঝি পৌঁছে আজ খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখা;– গ্রহ ভ'রে মানুষ আজ মত্ত পাশবিক আচরণে; মানুষ হনন ক'রে চলছে মানুষ; মানুষ বন্দী আর পীড়ন ক'রে চলছে মানুষকে। কয়েক বছর আগে *নারী* লিখেছিলাম মানুষের পরাভূত লিঙ্গটির মুক্তির প্রস্তাব হিশেবে; এখন দেখছি মানুষের হাত থেকে উদ্ধার করা দরকার নারী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গকেই। আমি পেশাদার নারীউন্নয়নজীবী নই; নারীর উন্নয়নের জন্যে আমি সংস্থা খুলি নি; আমি লিখেছি একটি বই। বইটির খ্যাতি আমাকে যেমন সুখী করে, তেমনি অভিভূত করে এজন্যে যে বইটি নারীসম্পর্কে আমাদের প্রথাগত দৃষ্টি অনেকখানি বদলাতে সাহায্য করেছে। তবে এটি শুধু নারীমুক্তির প্রস্তাব নয়; এটি মানুষ প্রজাতিরই মুক্তির প্রস্তাব। বইটিতে আমি প্রথাগত প্রায়-সমস্ত চিন্তা আর ভাবাদর্শ বাতিল করেছি; কেননা প্রথাগত চিন্তাধারা মানুষের মুক্তির বিরোধী। কোনো কিছুরই শাশ্বত মহত্ত্বে আমার বিশ্বাস বিশ্বাস নেই; কোনো কিছু মহৎ ব'লে প্রচারিত ব'লেই তা বিনাপ্রশ্নে মেনে নিতে হবে, তাও আমি মনে করি না। তাই প্রথাগত সমস্ত কিছু সম্পর্কেই আমি প্রশ্ন তুলেছি; বৈজ্ঞানিক রীতিতে বাতিল করেছি। পৃথিবী জুড়েই মানুষ নিজের কাঠামোতে বাঁচে না; বেঁচে থাকতে বাধ্য হয় অন্যের কাঠামোতে; ওই কাঠামো তাকে বন্দী ক'রে রাখে। অন্যের কাঠামোতে সবচেয়ে বেশি বাস করে নারী; অন্যের কাঠামোতে বাস ক'রে ক'রে নারী বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

মানুষের এক বড়ো সমস্যা ভাবাদর্শ। মানুষকে বিভিন্ন ভাবাদর্শের মধ্যে বাস করতে হয়; এবং মানুষকে শেখানো হয়েছে যে ভাবাদর্শের মধ্যে বাস করাই শ্রেষ্ঠ কাজ। তবে মানুষ জন্মেছে মানুষরূপে বাস করার জন্যে, ভাবাদর্শ যাপনের জন্যে নয়। ভাবাদর্শের এক মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে তা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে; যেমন আজকাল দেখা দিচ্ছে মৌলবাদী ভাবাদর্শ। মৌলবাদী ভাবাদর্শ হচ্ছে বন্দী করার ভাবাদর্শ; তা একগোত্র মধ্যযুগীয় মানুষের দখলে আনতে চায় মানবসমাজকে। মৌলবাদ মানুষের বিকাশের বিরোধী; আর মৌলবাদ যেহেতু পীড়নবাদ, তাই পীড়ন করে সব কিছুকে। নারী তার পীড়নের প্রধান লক্ষ্য। মৌলবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'লে নারীর মুখ আর দেখা যাবে না;–তাকে পথে দেখা যাবে না, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যাবে না; একেবারেই দেখা যাবে না কোনো কর্মস্থলে। নারী হবে নিষিদ্ধ; আর সব কিছু হবে নারীর জন্যে নিষিদ্ধ। কিন্তু পৃথিবীটা মানুষের;–নারীর ও পুরুষের; উভয়ে মিলেই বিকাশ ঘটাবে সভ্যতা ও মানুষের। তাই দরকার মৌলবাদ সম্পর্কে সাবধান থাকা; বিশেষ ক'রে নারীকে সাবধান থাকতে হবে; কেননা ওই মতবাদে নারী সত্তাহীন প্রাণী।

বাঙলাদেশ প্রতিমুহূর্তে হয়ে উঠছে পূর্ববর্তী মুহূর্তের থেকে অধিক মধ্যযুগীয়; খুব দ্রুত এখানে লোপ পাচ্ছে মুক্তচিন্তার অধিকার। দিকে দিকে এখন প্রচার পাচ্ছে পুরোনো বুলি; পুরোনো বুলির অসার মহত্ত্বে সবাই এখন মুগ্ধ। সবাই ভয় পাচ্ছে সত্যকে, আর মিথ্যেকেই আঁকড়ে ধরছে সত্য ব'লে। এর মূলে রয়েছে বাঙলাদেশের রাজনীতি, যা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে চলছে। এ-রাজনীতি নারীকে ঠেলে দিচ্ছে চরম অন্ধকারের দিকে। ষাটের দশকেও নারীরা যতোটা অগ্রসর ছিলো, এখন আর তা নেই; তারা পিছিয়ে পড়ছে–চিন্তা ও জীবনের সব দিকে; শিক্ষিত নারীরাও আজকাল যে-সব বিশ্বাস পোষণ করেন, তার থেকে শোচনীয় অপবিশ্বাস আর হয় না। এমন এক ধারণা প্রচলিত হচ্ছে এখন যেনো পৃথিবীতে সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে; আমাদের কাজ ওই সিদ্ধান্তগুলো মেনে চ'লে জীবন সার্থক করা। কিন্তু সত্য হচ্ছে মানুষ আরো কয়েক কোটি বছর টিকে থাকবে; তার ভবিষ্যৎ গত তিন হাজার বছরের নির্দেশে চলতে পারে না।

অতীত হচ্ছে অতীত;–অতীতকে জানতে হবে, কিন্তু অতীতের বিধানে চলা হাস্যকর ও শোককর। কিন্তু অতীত আমাদের ওপর বোঝার মতো চেপে আছে; দিন দিন তার বোঝা আরো বাড়ছে। মানুষকে আমি ওই বোঝা থেকে মুক্ত দেখতে চাই; তাই *নারী*তে প্রবলভাবে পেশ করা হয়েছে অতীত বিরোধিতা। মানুষ কতোটা মুক্ত তার একটি মানদণ্ড হচ্ছে সে অতীত থেকে কতোটা মুক্ত। বইটি শুধু নারীমুক্তির প্রস্তাব নয়; এটি বর্তমান সভ্যতাকেই বদলে দেয়ার প্রস্তাব। তাই *নারী* যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে; তেমনি, খুবই সচেতন আমি, প্রতিপক্ষও জুটেছে প্রচুর। আমি নিয়মিত প্রগতিবিরোধী প্রতিপক্ষের সদস্যদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করি। কিছু আগে এক মৌলবাদীগোত্র আমাকে *মুরতাদ*, শব্দটির কী অর্থ আমি জানি না, উপাধি দিয়েছে; একটি গোত্র হত্যার সংক্ষিপ্ত তালিকায় রেখে আমাকে সম্মানিত করেছে। আমার

মাতৃভূমি হয়ে উঠেছে এমনই মর্মস্পর্শী ও ভয়াবহ। বাঙালি মুসলমানের এটা এক বড়ো দুর্ভাগ্য; তারা বিকশিত হ'তে চায় না; তারা জীবিত প্রতিভাদের হত্যা করতে চায়,–আমি অবশ্য প্রতিভা নই–, আর মৃতদের মাজারে মোমবাতি জ্বালে। কেউ কেউ কাজ করছে আরো নিপুণভাবে; তারা গোপনে চক্রান্ত করছে বইটির বিরুদ্ধে; যাতে বইটিকে বিলুপ্ত ক'রে দেয়া যায়, তার উপায় খুঁজছে তারা। আমি আশা করবো অমন কলঙ্ক ঘটবে না।

এ-সংস্করণে যোগ করা হলো একটি পরিচ্ছেদ, যার নাম 'ধর্ষণ'। এটি যোগ করার কারণ ধর্ষণ নারীপীড়নের চরম রূপ; এবং এখনকার বাঙলাদেশ ধর্ষণপ্রবণ। যখন পরিচ্ছেদটি লিখছিলাম, তখনই ব্রজমোহনে দলবেঁধে ছাত্ররা ধর্ষণ করে একটি ছাত্রীকে; আর দিনাজপুরে পুলিশ দলবেঁধে ধর্ষণ ও হত্যা করে একটি কিশোরীকে, যার ফলে দেখা দেয় গণঅভ্যুত্থান; নিহত হয় দশজন বিবেকী পুরুষ। এছাড়াও বইটিতেই করা হয়েছে নানা সংশোধন ও সংযোজন, যা বইটিকে দিয়েছে পরিশুদ্ধ রূপ।

১৪ই ফুলার রোড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা
৯ ভাদ্র ১৪০২ : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

হুমায়ুন আজাদ

অবতরণিকা [অংশ] : প্রথম সংস্করণ

নারী সম্ভবত মহাজগতের সবচেয়ে আলোচিত প্রাণী : কথাটি ভার্জিনিয়া উল্‌ফের, যিনি নিজের বা নারীর জন্যে একটি নিজস্ব কক্ষ চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি। ওই আলোচনায় অংশ নিয়েছে প্রতিপক্ষের সবাই; শুধু যার সম্পর্কে আলোচনা, সে-ই বিশেষ সুযোগ পায় না অংশ নেয়ার। প্রতিপক্ষটির নাম পুরুষ, নিজের বানানো অলীক বিধাতার পার্থিব প্রতিনিধি; আর পুরুষমাত্রই প্রতিভাবান, তার বিধাতার চেয়েও প্রতিভাদীপ্ত;– অন্ধ ও বধির, লম্পট ও ঋষি, পাপী ও প্রেরিতপুরুষ, দালাল ও দার্শনিক, কবি ও কামুক, বালক ও বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ পুরুষপ্রজাতির সবাই অংশ নিয়েছে নারী সম্পর্কে অন্তত একটি শ্লোক রচনায়। ওই সব শ্লোক অশ্লীল আবর্জনার মতো। প্রতিপক্ষ কখনো কারো মূল্য বা অধিকার স্বীকার করে না; এমনকি অস্তিত্বই স্বীকার করে না অনেক সময়। তাই পুরুষেরা নারী সম্পর্কে কয়েক হাজার বছরে রচনা করেছে যে-সব শ্লোক-বিধি-বিধান, তার সবটাই সন্দেহজনক ও আপত্তিকর। পুরুষ নারীকে দেখে দাসীরূপে, ক'রে রেখেছে দাসী; তবে স্বার্থে ও ভয়ে কখনোকখনো স্তব করে দেবীরূপে। পুরুষ এমন প্রাণী, যার নিন্দায় সামান্য সত্য থাকতে পারে; তবে তার স্তব সুপরিকল্পিত প্রতারণা। পুরুষ সাধারণত প্রতারণাই ক'রে এসেছে নারীকে; তবে উনিশশতক থেকে একগোত্র পুরুষ লড়াই করছেন নারীর পক্ষে।

পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য কুৎসিত অভিধায়; তাকে বন্দী করার জন্যে তৈরি করেছে পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্র; উদ্ভাবন করেছে ঈশ্বর, নিয়ে এসেছে প্রেরিতপুরুষ;

ধর্ষণ

নারীর ওপর পুরুষের বলপ্রয়োগের চরম রূপ ধর্ষণ, যাতে পুরুষ নারীর সম্মতি ছাড়া তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। পুরুষ সুবিধার জন্যে বা আক্রোশবশত নারীকে খুন করতে পারে– মাঝেমাঝেই করে; কিন্তু খুনের থেকেও মর্মান্তিক ধর্ষণ, কেননা খুন নারীটিকে কলঙ্কিত করে না। ধর্ষণ একান্ত পুরুষের কর্ম; নারীর পক্ষে পুরুষকে খুন করা সম্ভব, কিন্তু ধর্ষণ করা সম্ভব নয়। পুরুষের দেহসংগঠন এমন যে পুরুষ সম্মত আর শক্ত না হ'লে নারী তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক পাতাতে পারে না; কিন্তু উত্তেজিত পুরুষ যে-কোনো সময় নারীকে তার শিকারে পরিণত করতে পারে। অসম্মত নারীর সাথে জোর ক'রে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াকে কয়েক দশক আগে সাধারণত বলা হতো *বলাৎকার*, এখন অকপটে বলা হয় *ধর্ষণ*। ধর্ষণ কোনো আধুনিক ব্যাপার নয়, এবং বিশেষ কোনো সমাজে সীমাবদ্ধ নয়। তবে কোনো কোনো সমাজ বিশেষভাবে ধর্ষণপ্রবণ, আর কোনো কোনো সমাজ অনেকটা ধর্ষণমুক্ত; যদিও সম্পূর্ণ ধর্ষণমুক্ত সমাজ ও সময় কখনোই ছিলো না, এখনো নেই। মানবসমাজ ধর্ষণের ইতিহাস লিখে রাখার দরকার বোধ করে নি; কিন্তু প্রাচীন পুরাণ ও উপাখ্যানে ধর্ষণের যে-বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় প্রাচীনেরা ধর্ষণকে অনেকটা ধর্মে ও দর্শনে পরিণত করেছিলো।

ভারতীয় পুরাণে পরাশর কর্তৃক সত্যবতীকে ধর্ষণের উপাখ্যান বিখ্যাত; আর দেবরাজ ইন্দ্র মাঝেমাঝেই স্বর্গমর্ত্য জুড়ে ধর্ষণ ক'রে বেড়াতো। গ্রিক পুরাণ ভ'রেই পাওয়া যায় ধর্ষণ, যাতে প্রধান ধর্ষণকারী দেবরাজ জিউস। গ্রিক পুরাণ জানিয়ে দেয় নারীদেহ পুরুষের কামাক্রমণের চিরকালীন লক্ষ্যবস্তু; এবং এতে এমন একটি বাণীও পাওয়া যায় যে আক্রমণ ও অধিকার করা যেতে পারে নারীকে, লুণ্ঠন করা যেতে পারে তার দেহ, যদি না সে বের করতে পারে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার কোনো চরম উপায়। আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার এক উপায় হচ্ছে মৃত্যুবরণ, মৃত্যুই নারীর ধ্রুব সখা; তবে গ্রিক পুরাণে ধর্ষণকারীকে প্রতিহত করার নাটকীয় উপায় রূপান্তরগ্রহণ। ধর্ষণকারীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করতে করতে, পেরে না উঠে, শেষ মুহূর্তে নারী নিজের শরীরকে রূপান্তরিত করে কোনো প্রাকৃতিক বস্তুতে; যেমন দাফনে অ্যাপোলোর কামক্ষুধা থেকে বাঁচার জন্যে রূপান্তরিত হয় লরেলতরুতে। তবে যারা পলাতে পারে না, বিশেষ ক'রে ধর্ষণকারী যখন কোনো দেবতা, তখন তাদের শরীরের ঘটে আরেক রূপান্তর; তারা গর্ভবতী হয়, প্রসব করে বীরসন্তান, যারা নগরপত্তন করে, সৃষ্টি করে সভ্যতা। পুরাণের নানা ব্যাখ্যা সম্ভব। গ্রিক পুরাণের ধর্ষণ সরাসরি কাম ও নারীপুরুষের ভূমিকা নির্দেশ করতে পারে; আবার নির্দেশ করতে পারে বিয়ে ও বিয়ের বাইরে নারনারীর আচরণের বিধিবিধান। পৌরাণিক ধর্ষণ অস্তিত্ব, ধর্ম ও রাজনীতিক ব্যাপারের প্রতীকও হ'তে পারে। গ্রিক পুরাণ পুরুষাধিপত্যবাদী সমাজের সৃষ্টি; তাই ধর্ষণ নির্দেশ

করতে পারে পুরুষাধিপত্য ও শিশ্নের শক্তি, যার রূপ দেখা যায় দেবরাজ, 'দেবতা ও মানুষের পিতা', জিউসের ক্রিয়াকলাপে। অলিম্পাসে অধিষ্ঠিত দেবরাজের শক্তির শেষ নেই, যা ঝলকে ওঠে তার রাজদণ্ড ও বজ্রে; এবং তার কামশক্তি আর কামনাও অনন্ত। সে তার কামশক্তি অবাধে প্রয়োগ করে দেবী আর মানবীদের ওপর। পৌরাণিক ধর্ষণের তাৎপর্য যাই হোক, তা প্রমাণ করে ধর্ষণ মানুষের সমান বয়সী। ব্রাউনমিলার বলেছেন, 'শুরুতে পুরুষ ছিলো প্রাকৃতিক লুণ্ঠনকারী আর নারী ছিলো প্রাকৃতিক শিকার' দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২৩০)।; এবং আজো তাই রয়ে গেছে।

পৃথিবীতে পৌরাণিক কাল আর নেই, দেবতারা আর ধর্ষণ করে না; তবে দেবতাদের স্থান নিয়েছে আজ পুরুষেরা; প্রায়-অবাধ ধর্ষণ চলছে পৃথিবী জুড়ে। ধর্ষণ এখন দেখা দিয়েছে মারাত্মক মড়করূপে;– আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত সমাজে যেমন চলছে ধর্ষণ, তেমনি চলছে বাঙলাদেশের মতো অনুন্নত সমাজে। বাঙলাদেশ এখন সবচেয়ে ধর্ষণপ্রবণ সমাজের একটি; মনে হচ্ছে পৌরাণিক দেবতারা আর ঋষিরা দলবেঁধে জন্মলাভ করেছে বাঙলাদেশে। ধর্ষণের সব সংবাদ অবশ্য জানা যায় না; সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে ধর্ষিতরাই তা চেপে রাখে; কিন্তু যতোটুকু প্রকাশ পায় তাতেই শিউরে উঠতে হয়। বাঙলাদেশে ধর্ষণ সবচেয়ে বিকশিত সামাজিক কর্মকাণ্ড, পৃথিবীতে যার কোনো তুলনা মেলে না। বাঙলাদেশে এককভাবে ধর্ষণ করা হয়, এবং দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়; এবং ধর্ষণের পর ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়। এখানে পিতা ধর্ষণ করে কন্যাকে (কয়েক বছর আগে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে এক পিতা ধর্ষণ করে তার তিন কন্যাকে), জামাতা ধর্ষণ করে শাশুড়ীকে, সহপাঠী ধর্ষণ করে সহপাঠিনীকে, আমলা ধর্ষণ করে কার্যালয়ের মেথরানিকে, গৃহশিক্ষক ধর্ষণ করে ছাত্রীকে, ইমাম ধর্ষণ করে আমপারা পড়তে আসা কিশোরীকে, দুলাভাই ধর্ষণ করে শ্যালিকাকে, শ্বশুর ধর্ষণ করে পুত্রবধূকে, দেবর ধর্ষণ করে ভাবীকে; এবং দেশ জুড়ে চলছে অসংখ্য অসম্পর্কিত ধর্ষণ। চলছে দলবদ্ধ ধর্ষণ;–রাতে গ্রাম ঘেরাও ক'রে পুলিশ দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে গৃহবধূদের (কয়েক বছর আগে ঠাকুরগাঁয়ে ঘটে এ-ঘটনা); নিজেদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে পুলিশ দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ ক'রে হত্যা করে একটি বালিকাকে; ১৯৯৫র আগস্ট মাসে, দিনাজপুরে, যার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সারা শহর, এবং প্রাণ দেয় সাতজন; মহাবিদ্যালয়ে প্রেমিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছাত্ররা দলগতভাবে ধর্ষণ করে ছাত্রীকে (ব্রজমোহন কলেজ, ১৯৯৫); মাস্তানরা বাসায় ঢুকে পিতামাতার চোখের সামনে দলগতভাবে ধর্ষণ করে কন্যাদের (বিভিন্ন শহর ও গ্রামে)। বাঙলাদেশ আজ ধর্ষণকারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ। বাঙলাদেশে নারী বাস করছে নিরন্তর ধর্ষণভীতির মধ্যে। চাষীর মেয়ে মাঠে যাবে–সে আর কোনো ভয় পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে ধর্ষণের; মেয়েটি ইস্কুলে বা মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে–সে আর কোনো ভয় পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে ধর্ষণের; মেয়েটি বাইরে যাবে–সে আর কোনো ভয় পাচ্ছে না, কিন্তু ভয় পাচ্ছে ধর্ষণের। সুজান গ্রিফিন বলেছেন, আমি কখনোই ধর্ষণের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারি নি' [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২২১)]। বাঙলাদেশে প্রতিটি নারী এখন সুজ্যান গ্রিফিন।

গভীর আর প্রশস্ত হয় ততোই ভালো। বিচার বিভাগ জানতে চায়, সে কি একটুও সুখ পেয়েছে? তাহলে চলবে না। বিলেতের এক বিচারক, সত্তরের দশকে, ধর্ষিতদের উপদেশ দিয়েছিলো : 'আপনারা দু-পা চেপে রাখবেন।' এক লেখিকা উত্তর দিয়েছিলেন, 'ধর্ষিত হওয়ার সময় দু-পা চেপে রাখার কথা মনে থাকে না।' বিচার বিভাগ আসলে ধর্ষিত নারীর কাছে কী চায়? চায় তার মৃত্যু। বিচার বিভাগ বলে, তোমার উচিত ছিলো ধর্ষণকারীকে বাধা দেয়া, যদিও তার হাতে একটা ছুরিকা ছিলো, যদিও তার হাতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র ছিলো, যদিও সে তোমার থেকে শক্তিমান; এবং তোমার উচিত ছিলো মৃত্যুবরণ। বিচার বিভাগ বা পুরুষতন্ত্র ধর্ষিত নারীর থেকে মৃত নারী পছন্দ করে। ধর্ষিত নারী অভিযোগ তোলে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে; মৃত নারী মেনে নেয় পুরুষতন্ত্রকে।

ধর্ষিত নারী পুলিশ পার হয়ে বিচারালয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় নতুন বিভীষিকা; পুলিশের নিষ্ঠুর আচরণের পর বিচারালয় মেতে ওঠে আরো নিষ্ঠুর আচরণে। পুরুষ ধর্ষিত নারীর অভিযোগ বিচারের যে-প্রক্রিয়া বের করেছে, তা দেখে মনে হয় ধর্ষণকারীর বিচার তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য ধর্ষিত নারীর বিচার। যেনো ধর্ষিত হয়ে সে অপরাধ করেছে; বিচারালয় সে-অপরাধটুকুই খুঁজে বের করতে চায়। বিচার চলার সময় পুরুষটির বদলে বিচারালয়ের সব মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে নারীটির ওপর। বিচারালয়ে প্রথমেই নারীটির চরিত্রের ওপর লেপন করা হয় একরাশ কলঙ্ককালিমা; খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করা হয় তার যৌনজীবনের ইতিহাস। অবিবাহিত নারী ধর্ষিত হ'লেই তার জীবন কলঙ্কিত হয়ে যায়; কিন্তু বিচার বিভাগের কাছে তা-ই যথেষ্ট নয়; বারবার তার কাছে জানতে চাওয়া হয় তার সঙ্গমের অভিজ্ঞতা আছে কি না, থাকলে তা কেমন, কার কার সাথে সে সঙ্গম করেছে, সঙ্গমে সে সুখ পায় কি না প্রভৃতি। আসামীর উকিল নিজের মক্কেলকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে নিয়ে থাকে কয়েকটি কৌশল : সে বারবার প্রশ্ন করে ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে;–কখন ধর্ষণ করা হয়েছে, কীভাবে করা হয়েছে, কতোক্ষণ করেছে, এসব সম্পর্কে সে বিরতিহীন প্রশ্ন করতে থাকে। নারীটিকে বারবার বর্ণনা করতে হয় নিজের ধর্ষিত হওয়ার উপাখ্যান। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই নারীর বিবৃতির মধ্যে অসঙ্গতি বের করা, আর দেখানো যে ঘটনাটিতে নারীটির সম্মতি ছিলো। যে-সব ক্ষেত্রে ধর্ষিত আর ধর্ষণকারী পূর্বপরিচিত সেখানে ব্যবহার করা হয় আরেক কৌশল। এ-ক্ষেত্রে চলতে থাকে কুৎসিত প্রশ্নের ঝড়, যার লক্ষ্য প্রমাণ করা যে তাদের মধ্যে আগে থেকেই যৌনসম্পর্ক ছিলো; এটা নতুন কিছু নয়, এবং ধর্ষণ নয়। তারপর রয়েছে চিরকালীন কৌশলটি, যার কাজ প্রমাণ করা যে নারীটি অসতী, আর দেখিয়ে দেয়া যে এমন অসতীর পক্ষে এমন স্থানকালে সঙ্গমে সম্মতি দেয়াই স্বাভাবিক। মনে করা যাক নারীটি সন্ধ্যার পর (বাঙলাদেশে) বা মধ্যরাতে (পশ্চিমে) বাসায় ফিরছিলো। তখন দাবি করা হবে যে-নারী সন্ধ্যার পর বা মধ্যরাতে বাড়ি ফেরে, তার চরিত্র ভালো নয়, তাই তার পক্ষে সম্মতি দেয়াই স্বাভাবিক।

এ তো উকিলের কাজ, আর উকিলের কাজ উকিল করবেই। ধর্ষিত নারীটি তাকে

সাজা দেয় নি, দিয়েছে ধর্ষণকারী; তাই সে সীমা পেরিয়ে গিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করবে মক্কেলকে। কিন্তু বিচারক কী করে? যখন উকিল অশ্লীল জেরা করতে থাকে নারীটিকে তখন মাননীয় বিচারকেরা কী করে? অপরাধমূলক বিচারে আইন শুধু প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করারই অনুমতি দেয়; কিন্তু ধর্ষণের মামলায় বিচারকেরা উকিলকে দেয় লাগামহীন স্বাধীনতা, যা পরিবেশকে ক'রে তোলে সবার জন্যে উপভোগ্য; আর নারীটির জন্যে পুনরায় ধর্ষিত হওয়ার সমান। বিচারকেরা উকিলদের শুধু অবাধ স্বাধীনতাই দেয় না, মাঝেমাঝে নিজেরাও আপত্তিকর মন্তব্যের পর মন্তব্য ক'রে উকিলদের উৎসাহিত আর ধর্ষিতকে পীড়িত ক'রে থাকে। ১৯৮২ সালে বিলেতে এক বিচারক মন্তব্য করে [দ্র টেমকিন (১৯৮৬, ১৯-২০)]। :

> যে-নারীরা না বলে তারা সব সময় না বোঝায় না। বিষয়টা শুধু না বলার নয়, বিষয়টা হচ্ছে সে কীভাবে না বলছে, কীভাবে সে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করছে। সে যদি এটা না চায় তাহলে তার উচিত তার দু-পা চেপে বন্ধ ক'রে রাখা। বলপ্রয়োগ ছাড়া তার ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়; তাই তার শরীরে বলপ্রয়োগের চিহ্ন থাকবেই।

ধর্ষিত হওয়া যেনো নারীরই অপরাধ– কেনো সে দু-পা চেপে সব কিছু বন্ধ ক'রে রাখে নি? ধর্ষণের বিচার ধর্ষিতাদের জন্যে চরম বিভীষিকার ব্যাপার। নিউজিল্যান্ডে ধর্ষণ সম্পর্কে গবেষকেরা জানিয়েছেন ধর্ষিতরা বিচারের পীড়নকে খারাপ মনে করে ধর্ষণের থেকেও; যা অনেকটা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সমতুল্য। ধর্ষিত নারী বিচার চাইতে গেলে ধর্ষিত হয় কমপক্ষে তিনবার– দুবার রূপকার্থে।

নারীর ওপর বলপ্রয়োগের চরম রূপ ধর্ষণ; কিন্তু এ-সম্পর্কে ইতিহাসরচয়িতারা সাধারণত চুপ থাকতেই পছন্দ করেছেন। বাশার বলেছেন, 'আজকের পুরুষ ঐতিহাসিকদের পক্ষে স্বস্তির সাথে আলোচনার জন্যে ধর্ষণ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, খুবই রাজনীতিক বিষয়' [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২১৬)]। পুরুষের লেখা অপরাধের ইতিহাসে ধর্ষণ গুরুত্ব পায় নি; তাকে গণ্য করা হয়েছে তুচ্ছ ব্যাপার ব'লে। ধর্ষণের বিভীষিকা প্রথম তুলে ধরেন আধুনিক নারীবাদীরা; এবং প্রস্তাব করেন ধর্ষণের তত্ত্ব। তাঁরা দাবি করেন ধর্ষণকে শুধু কিছু ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের বিকৃত কাজ ব'লে একপাশে সরিয়ে রাখা যায় না; ব্যাপারটিকে বুঝতে হবে লৈঙ্গিক সম্পর্ক ও লৈঙ্গিক রাজনীতি, কলঙ্কিত ও নিন্দিতকরণ, সন্ত্রাস ও অপরাধের ভাষায়। কেইট মিলেটই (১৯৬৯, ৪৩-৪৬) প্রথম 'বলপ্রয়োগ' নামে ধর্ষণ বিষয়টি আলোচনা করেন; দেখান যে পিতৃতন্ত্রে নারীর ওপর পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠার কৌশলগুলোর একটি ধর্ষণ। ১৯৭৫-এ বেরোয় ধর্ষণ সম্পর্কে সুজান ব্রাউনমিলারের সাড়াজাগানো বই *আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে : পুরুষ, নারী ও ধর্ষণ*। তাঁর বইয়ের প্রধান প্রতিপাদ্য হচ্ছে ধর্ষণ সব সময়ই কাজ করেছে এক প্রধান সামাজিক শক্তিরূপে, পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রীয় উপাদানরূপে। এরপর বেরিয়েছে বহু বই : ক্যারোলিন হার্সের *ধর্ষণ নিয়ে সমস্যা* (১৯৭৭), সুজ্যান গ্রিফিনের *ধর্ষণ : চেতনার শক্তি* (১৯৭৮), রুথ ই হলের *যে-কোনো নারীকে জিজ্ঞেস করুন* (১৯৮৫) প্রভৃতি, ও আরো বহু বই ও নিবন্ধ।

পুরুষ কেনো ধর্ষণ করে? এ-সম্পর্কে পাওয়া যায় তিনটি তত্ত্ব : একটি নারীবাদীদের, একটি সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের, ও একটি জীববিজ্ঞানীদের। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্বে ধর্ষণ একটা সামাজিক ব্যাধি, যার উদ্ভব ঘটেছে আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজের জটিলতা থেকে। এ-তত্ত্বটি বাতিল হয়ে যায় সহজেই; কেননা ধর্ষণ শুধু আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজে সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ষণ আগেও ছিলো, এখনও আছে; শিল্পোন্নত সমাজে যেমন রয়েছে ধর্ষণ, তেমনি রয়েছে এ-কালের আদিম ও অর্ধআদিম সমাজগুলোতে। ধর্ষণ আন্তঃসাংস্কৃতিক। ধর্ষণ সম্পর্কে নারীবাদী ও জীববিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সমন্বয় করলে পাওয়া যায় ধর্ষণ সম্পর্কে বেশ স্বচ্ছ ধারণা। ধর্ষণ সম্পর্কে নারীবাদীদের তত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে নারীর ওপর পিতৃতান্ত্রিক পুরুষাধিপত্যের একটি কৌশল হিশেবেই পিতৃতন্ত্র লালন ক'রে আসছে ধর্ষণ; আর জীববিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সারকথা হচ্ছে বিবর্তনের ফলেই পুরুষের কামতৃপ্তির একটি প্রক্রিয়ারূপে উদ্ভূত হয়েছে ধর্ষণ। নারীবাদীরা ধর্ষণ সম্পর্কে দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন : প্রথমটি হচ্ছে ধর্ষণ শুধু ধর্ষণকারীর আলোকে বোঝা সম্ভব নয়, বুঝতে হবে পুরুষের সমগ্র মূল্যবোধের আলোকে; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধর্ষণ যতোটা অবদমিত কামের প্রকাশ তারচেয়ে অনেক বেশি প্রকাশ নারীবিদ্বেষের।

কেইট মিলেট *লৈঙ্গিক রাজনীতি* (১৯৬৯) গ্রন্থে ধর্ষণের যে-তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন, তাই সম্প্রসারিত ক'রে ব্রাউনমিলার *আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে* (১৯৭৫) গ্রন্থে প্রস্তাব করেন ধর্ষণের বিস্তৃত তত্ত্ব। তাঁর তত্ত্বই এখন ধর্ষণের নারীবাদী তত্ত্ব হিশেবে গৃহীত। নারীবাদীরা নারীর অস্তিত্বকে দেখেন পিতৃতান্ত্রিক পীড়ন ও আধিপত্যের কাঠামোতে; তাঁরা মনে করেন পিতৃতন্ত্রের উদ্ভবই নারীর দুরবস্থার মূলে। কেউ কেউ পিতৃতন্ত্র ও পীড়নকে একার্থক ব'লেই মনে করেন। যেমন, মেরি ড্যালি পিতৃতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : 'পিতৃতন্ত্র, ধর্ষণবাদের ধর্ম' [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২৩১)]। ব্রাউনমিলার ধর্ষণের স্বরূপ দেখাতে গিয়ে দাবি করেন যে প্রকৃত ধর্ষণকারী কোনো ব্যক্তি নয়, প্রকৃত ধর্ষক হচ্ছে পিতৃতন্ত্র। তাঁর মতে ধর্ষণ পিতৃতন্ত্রের জন্যে দরকার; কেননা ধর্ষণ পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ নয়, ধর্ষণ পিতৃতন্ত্রকে বিপন্ন করে না; বরং কাজ করে পিতৃতন্ত্রের সেনাবাহিনীর মতো। পিতৃতন্ত্র 'পৌরুষ'কে দেখে যে-মুগ্ধ চোখে, আর পোষণ করে যে-নারীবিদ্বেষ, তাতে গ'ড়ে ওঠে এমন গণমনস্তত্ত্ব, যা উৎসাহিত করে ধর্ষণকে। পুরুষের মধ্যে কেউ কেউ ধর্ষণের কাজ করে, সবাই করে না; তবে সব পুরুষই সম্ভাব্য ধর্ষণকারী। সুযোগ পেলে, যেমন যুদ্ধের সময় অবরোধকারী সেনাবাহিনী উল্লাসের সাথে করে (স্মরণীয় : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কোরিয়ায় জাপানি বাহিনী; ১৯৭১-এ বাঙলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী) সব পুরুষই ধর্ষণের কাজটি করতে পারে; আর বহু স্বামী বাসর ঘরে ও অন্যান্য সময় যে-যৌন আচরণ করে, তা ধর্ষণের পর্যায়ে পড়ে। বহু স্বামী নিয়মিতভাবে ধর্ষণ করে স্ত্রীদের। ইতিহাস ভ'রেই ধর্ষণ চ'লে আসছে, যদিও তা স্বীকার করা হয় নি। ব্রাউনমিলারের মতে ধর্ষণ বৈধতা দেয় পিতৃতন্ত্রকে। কর্ম হিশেবে ধর্ষণ বর্বরভাবে নারীকে করে পুরুষের ইচ্ছার অধীন; আর

হিশেবে ধর্ষণ সব সময় খবরদারি করে নারীর আচরণের ওপর। ধর্ষণ সীমিত করে নারীর স্বাধীনতা; আর প্রচার করে পিতৃতন্ত্রের ভাবাদর্শ যে পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ নারীর সব সময়ই দরকার। নারী যেখানেই যায় কোনো-না-কোনো মহৎ পুরুষ তার অভিভাবকত্ব করে; তাকে আগলে রাখতে চায়। এটা দেখেই মে ওয়েস্ট পরিহাস ক'রে বলেছিলেন, 'কী মজার, যে-পুরুষেরই সাথে দেখা হয় সে-ই আমাকে রক্ষা করতে চায়; আমি বুঝতে পারি না কী থেকে' [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২১৮)]।

ব্রাউনমিলার বের করতে চেয়েছেন ধর্ষণের প্রতি পিতৃতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি। আদি বাইবেলের ইহুদি বিধান থেকে সামন্ততন্ত্রের বিধান পর্যন্ত সমাজ ধর্ষণকে দেখেছে কী চোখে? বাইবেলি আর সামন্ত সমাজের চোখে ধর্ষণ কোনো নারীর কাছে কোনো পুরুষের অপরাধ নয়; ধর্ষণ ছিলো এক পুরুষের কাছে আরেক পুরুষের অপরাধ। ধর্ষণ বিবেচিত হতো চৌর্যবৃত্তি ব'লে, যাতে একটি পুরুষ চুরি করতো আরেক পুরুষের ধন; – ওই বিধানে চোর কোনো নারীর কাছে অপরাধ করতো না, করতো আরেক পুরুষের কাছে। অপরাধটি ছিলো যে চোর কোনো নারীকে চুরি করেছে তার বৈধ মালিকের–পিতা বা স্বামীর–কাছে থেকে; এবং হরণ করেছে তার সতীত্ব, যার মালিক তার পিতা বা স্বামী। নারীটি যদি অবিবাহিত হতো, ধর্ষণের ফলে নষ্ট হয়ে যেতো বিয়ের বাজারে তার পণ্যমূল্য; সতীত্ব নষ্ট হওয়ায় তার পরিবারের ওপর পড়তো কলঙ্ক। তখনকার বিচারব্যবস্থা পরিবারের প্রধানকে, পিতা বা স্বামীকে, ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করতো। ধর্ষিত মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেয়া হতো যাজিকাশ্রমে, বা বিয়ে দেয়া হতো হরণকারী বা ধর্ষণকারীর সাথে। ধর্ষণের ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত যে-নারী, তা স্থির করতে কয়েক হাজার বছর লেগেছিলো পিতৃতন্ত্রের।

ব্রাউনমিলার ও নারীবাদীদের মতে ধর্ষণ কিছু বিকৃত মনোব্যাধিগ্রস্ত মানুষের কাজ নয়, সমাজেরই কাজ; ধর্ষণ বিকারগ্রস্তের রোগ নয়, পিতৃতন্ত্রেরই রোগ। ব্রাউনমিলার বলেছেন, 'প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত, আমার বিশ্বাস, ধর্ষণ এক চরম ভূমিকা পালন ক'রে এসেছে; এটা এক সচেতন ভীতিপ্রদর্শনপ্রক্রিয়া, যার সাহায্যে সব পুরুষ সব নারীকে রাখে সন্ত্রস্ত অবস্থায়' [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২১৮)]। নারী বাস করে ধর্ষণকারীর দীর্ঘ ছায়ার নিচে। ধর্ষণ নারীর ওপর পুরুষের বলপ্রয়োগের মূল অস্ত্র; ধর্ষণ এক রাজনীতিক অপরাধ, নারীকে অধীনে রাখার পুরুষের চরম উপায়। ধর্ষণ যে এক রাজনীতিক অস্ত্র, এ-মতের বিকাশ ঘটে যুক্তরাষ্ট্রে; কেননা সেখানেই লৈঙ্গিক রাজনীতিতে ধর্ষণ একটি বড়ো হাতিয়ার ব'লে গণ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের পরিমাণ ভীতিকরভাবে বেশি; ১৯৭৯ সালে জানা যায় ৭৫, ৯৮৯টি ধর্ষণের ঘটনা; এরপর আরো বাড়ে ধর্ষণের পরিমাণ। যুক্তরাষ্ট্রেই ধর্ষণকে রাজনীতিক রূপ দিয়েছে পুরুষেরাই; ব্ল্যাক প্যান্থার নেতা এলড্রিজ ক্লিভার কালোদের সংগ্রামের কৌশল হিশেবে অনুসারীদের নির্দেশ দেয় শ্বেত নারীদের ধর্ষণের [দ্র পোর্টার (১৯৮৬, ২১৮)]। ধর্ষণ যে অনেকটা রাজনীতিক ব্যাপার এটা বোঝা যায় দখলকারী সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলের নারীদের ধর্ষণের ঘটনায়। ব্রাউনমিলার মনে করেন ধর্ষণের উদ্ভব ঘটেছে আদিকাল থেকে পুরুষের দেহ ও মনস্তত্ত্বের বিবর্তনের ফলে; তবু এটা একটি রাজনীতিক অপরাধ।

পুরুষই শুধু ধর্ষণ করতে পারে, নারী পারে না। পুরুষের শরীরসংগঠন ধর্ষণের যোগ্যতাসম্পন্ন। ব্রাউনমিলার বলেছেন, 'ধর্ষণ করার জন্যে পুরুষের শারীরিক যোগ্যতাই সৃষ্টি করেছে পুরুষের ভাবাদর্শ, যার নাম ধর্ষণ।'

ধর্ষণের পরিমাণ সব দেশে সমান নয়, সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে পার্থক্য রয়েছে ধর্ষণহারের। সব সমাজ ধর্ষণকারীদের সমানভাবে অনুপ্রাণিত করে না। কিছু সমাজ অনেকটা ধর্ষণমুক্ত, কিছু সমাজ প্রচণ্ড ধর্ষণপ্রবণ। পশ্চিম সুমাত্রা প্রায়ধর্ষণমুক্ত; সেখানে ধর্ষণকারী নিজেকে ছোটো করে, ছোটো করে তার আত্মীয়পরিজনকে। সেখানে সবাই পরিহাস করে তার পৌরুষকে; তার ভাগ্যে জোটে পীড়ন, কখনো মৃত্যু; অনেক সময় সে নির্বাসিত হয় গ্রাম থেকে, যেখানে সে আর ফিরে আসতে পারে না। [দ্র স্যানডে (১৯৮৬, ৮৪)]। কিছু সমাজ ধর্ষণপ্রবণ, যেমন বাঙলাদেশ। কোন সমাজ উৎসাহিত করে ধর্ষণ? যে-সমাজ বিশৃঙ্খল, যে-সমাজে মৌলবাদের বিকাশ ঘটছে কিন্তু মৌলবাদী কঠোরতা নেই, যে-সমাজ পুরুষাধিপত্যবাদী, যে-সমাজে কারোই নিরাপত্তা নেই, আর নারী যেহেতু সমাজে সবচেয়ে অসহায়, তাই সেখানে ধর্ষণ প্রকটরূপে দেখা দেয়। বাঙলাদেশে মাস্তান ছাড়া সবাই অসহায়; তাই বাঙলাদেশ হয়ে উঠেছে ধর্ষণের লীলাভূমি। ম্যালিনোস্কি বলেছেন, 'কাম, বিস্তৃততম অর্থে, শুধু দুটি মানুষের শারীর সম্পর্ক নয়, এটা এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি।' নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন নারীপুরুষের লৈঙ্গিক পার্থক্যের পেছনে প্রাকৃতিক যে-ভিত্তিই থাকুক-না-কেনো, নারী আর পুরুষ, কাম আর সন্তান উৎপাদন সাংস্কৃতিক ব্যাপার [দ্র স্যানডে (১৯৮৬, ৮৪)]। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ধর্ষণের ব্যাপার দেখে এ-মতটিকেই মেনে নিতে হয়। পুরুষ জন্মসূত্রেই পাশবিক বা ধর্ষণপ্রবণ এটা কোনো কাজের কথা নয়; মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে ধর্ষণের ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যায় না। কামের জৈবিক ভিত্তি অবশ্যই রয়েছে, তবে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ধর্ষণের ঘটনার যে ভিন্নতা দেখা যায়, তাতে এটা স্পষ্ট যে সংস্কৃতি মানুষের কামপ্রবৃত্তিকে প্রবলভাবেই চালিত করে। ধর্ষণ পুরুষাধিপত্যের সামাজিক ভাবাদর্শেরই প্রকাশ। ধর্ষণপ্রবণ সমাজে নারীর ক্ষমতা আর আধিপত্য নেই, নারী সেখানে কোনো সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে না–যদিও কোনো নারী হঠাৎ সরকারপ্রধান হয়ে যেতে পারে; সেখানকার পুরুষেরা ঘৃণা করে নারীর সিদ্ধান্ত। ধর্ষণপ্রবণ সমাজে পৌরুষ বলতে বোঝানো হয় হিংস্রতা আর কঠোরতা। বাঙলাদেশ এমনই এক সমাজ।

জীববিজ্ঞানীরা বিবর্তনবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করেন ধর্ষণ ব্যাপারটিকে [দ্র থর্নহিল ও অন্যান্য (১৯৮৬)]। তাঁদের মতে ধর্ষণ পুরুষের এমন আচরণ, যা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিবর্তনতত্ত্বের বিরোধী। তবে তাঁরা মনে করেন ধর্ষণ হয়তো বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ শর্তনির্ভর এক আচরণ। এ-মত অনুসারে ধর্ষণে লিপ্ত হয় সে-পুরুষেরাই, যারা কাঙ্খিত সঙ্গিনীকে পাওয়ার প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ, যারা প্রয়োজনীয় সম্পদ আর মর্যাদার অধিকারী নয়। এ-মতের ভিত্তি হচ্ছে বলপ্রয়োগে সঙ্গমের তুলনামূলক জীববিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানীরা প্যানোর্পা প্রজাতির বৃশ্চিকমক্ষিকার আচরণ পর্যবেক্ষণ ক'রে কীভাবে

বলপ্রয়োগে সঙ্গমের উদ্ভব ঘটেছে, সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। ব্যাপারটি এমন। পুরুষ প্যানোর্পা ক'রে থাকে তিন রকম যৌন আচরণ। প্রথম আচরণ দুটি বেশ মধুর, বেশ সফল পুরুষের আচরণ : এ-ক্ষেত্রে পুরুষ প্যানোর্পা বিনামূল্যে কাম চরিতার্থ করতে চায় না; সে সঙ্গম চায় খাদ্যের বিনিময়ে–সে সঙ্গমের আগে নারী প্যানোর্পার সামনে খাবার রাখে; নারী প্যানোর্পাটি যখন খাবার খেতে থাকে, তখন পুরুষটি সঙ্গমের কাজ সম্পন্ন করে। তৃতীয় আচরণটি হচ্ছে সবল সঙ্গম বা বলাৎকার বা ধর্ষণ। এ-ক্ষেত্রে পুরুষ প্যানোর্পা নারী প্যানোর্পাকে কোনো সঙ্গমপূর্ব খাবার দিতে পারে না, তাই নারী প্যানোর্পাকে সে আকৃষ্ট করতে পারে না। নারী প্যানোর্পা তার আবেদনে সম্মত হয় না ব'লে সে বলপ্রয়োগ করে। পাশ দিয়ে কোনো নারী প্যানোর্পা যাচ্ছে দেখলেই পুরুষ প্যানোর্পা তার দিকে ছুটে যায়, নিজের নমনীয় তলপেট বাড়িয়ে দেয়। যদি সে নারীটির একটি পা বা পাখা আটকে ধরতে পারে, তবে সে নারী প্যানোর্পাটিকে স্থাপন করে নিজের জন্যে সুবিধাজনকভাবে, বলপ্রয়োগে কাবু ক'রে ফেলে নারী প্যানোর্পাটিকে, এবং শক্ত ক'রে ধ'রে সঙ্গমের কাজ সম্পন্ন করে। পুরো কাজের সময় সে নারী প্যানোর্পাটিকে শক্তভাবে ধ'রে রাখে। পুরুষ প্যানোর্পার এ-বলাৎকারকে কিছুতেই অস্বাভাবিক বা বিকৃত আচরণ বলা যায় না;– প্যানোর্পাদের সমাজ রাষ্ট্র সভ্যতা বিজ্ঞান দর্শন মনোবিজ্ঞান নেই। কিছু কিছু পুরুষ প্যানোর্পার মধ্যে এ-ধরনের আচরণের বিকাশ ঘটেছে বিবর্তনের ফলেই।

নারী প্যানোর্পার আচরণও লক্ষ্য করার মতো;– যে-পুরুষ প্যানোর্পা তাকে সঙ্গমপূর্ব দেনমোহর বা খাবার দিতে পারে, তার সাথে নারী প্যানোর্পা বেশ মধুর আচরণ করে; আর যে-পুরুষ প্যানোর্পা সঙ্গমপূর্ব খাবার দিতে পারে না, তাকে সে নিজের কাছে ঘেষতে দেয় না, তার কাছ থেকে সে দ্রুত পালিয়ে বাঁচে। এমন গরিব পুরুষ প্যানোর্পা তাকে ধ'রে ফেললে সে তার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে লড়াই করে; কিন্তু সম্পদশালী পুরুষ প্যানোর্পা সঙ্গম করতে চাইলে সে বাধা দেয় না। নারী প্যানোর্পার সাথে সঙ্গমের জন্যে পুরুষ প্যানোর্পা কৌশল তিনটির কোনটি প্রয়োগ করবে, তা নির্ভর করে খাবারের সুলভতা-দুর্লভতার ওপর। এগুলোর খাদ্য হচ্ছে মরা সন্ধিপদী পতঙ্গ। সঙ্গমের অধিকার লাভের জন্যে পুরুষ প্যানোর্পা প্রথম যে-কৌশলটি প্রয়োগ করে, সেটিই শ্রেষ্ঠ কৌশল;–সে নারী প্যানোর্পার সামনে মরা পতঙ্গ নিবেদন করে। মরা পতঙ্গের অভাবে সে বেছে নেয় দ্বিতীয় কৌশলটি;–সে নারীটিকে নিবেদন করে নিজের ভেতর থেকে নিঃসৃত লালা। কিন্তু লালাও যদি সে দেনমোহর হিশেবে দিতে না পারে, তখন বেছে নেয় চরম কৌশলটি–সে নারী প্যানোর্পাটিকে জোর ক'রে ধ'রে সঙ্গম করে। পুরুষ প্যানোর্পার দেহের আকৃতিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বড়ো আকারের পুরুষ প্যানোর্পা সাধারণত খাবার বা লালা নিবেদন করতে পারে, তাই তার বলাৎকার করার দরকার পড়ে না; বলাৎকার সাধারণত ক'রে থাকে ছোটো আকারের পুরুষ প্যানোর্পা।

পুরুষ প্যানোর্পা সঙ্গমের কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবে, তা নির্ভর করে তার যোগ্যতার ওপর; আর তার যোগ্যতার বিচারক হচ্ছে নারী প্যানোর্পা। নারী প্যানোর্পার কাছে সে-পুরুষ প্যানোর্পাই সবচেয়ে যোগ্য, যে খাবার হিশেবে মরা পতঙ্গ সরবরাহ করতে

পারে। যে-পুরুষ প্যানোর্পা লালা নিবেদন করে, আর যে-পুরুষ প্যানোর্পা মরা পতঙ্গ নিবেদন করে, তাদের মধ্যে পতঙ্গশালী প্যানোর্পার সাথেই সে সঙ্গমে সম্মত হয়। যে খাবার বা লালা কিছুই যোগাতে পারে না, শুধু জোর ক'রে সঙ্গম করতে চায়, এমন পুরুষের সাথে সে মিলতেই রাজি হয় না; তার উদ্যোগকে সে সব শক্তি দিয়ে বাধা দেয়। পুরুষ প্যানোর্পার বলপ্রয়োগে সঙ্গম নারী প্যানোর্পার পছন্দ নয়; শুধু জোর ক'রেই পুরুষ প্যানোর্পা নারী প্যানোর্পার ওপর এমন কাজ সম্পন্ন করে।

সঙ্গমের অধিকার লাভের জন্যে পুরুষ প্যানোর্পারা যে-প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে যায়, তার প্রকৃতি দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সম্ভব যে যেখানে সঙ্গমের সঙ্গিনী লাভ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে একটি বিকল্প আচরণরূপে বিকশিত হ'তে পারে বলপ্রয়োগে সঙ্গম। যখন নারী তার সঙ্গী বেছে নেয় পুরুষের সম্পদ ও মর্যাদা অনুসারে, আর পুরুষদের মধ্যে একদল থাকে সম্পদশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন, এবং আরেকদল থাকে সম্পদ ও মর্যাদাহীন, তখন সম্পদ আর মর্যাদাহীনেরা ধর্ষণকেই বেছে নিতে পারে কার্যকর বিকল্পরূপে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে প্যানোর্পার আচরণ থেকে আহরিত এ-সিদ্ধান্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রোযোজ্য কি না? আমরা কি বলবো যেহেতু কিছু কিছু অমনুষ্য প্রাণীর পুরুষেরা বিশেষ কারণে বলপ্রয়োগে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তাই মনুষ্য পুরুষেরাও লিপ্ত হবে বলাৎকারে? আমরা কি বলবো যে বিবর্তনের ফলে যেমন প্যানোর্পার মধ্যে একটি বিকল্প আচরণ হিশেবে দেখা দিয়েছে বলপ্রয়োগে সঙ্গম, একইভাবে বিবর্তনের ফলেই মানুষ পুরুষের মধ্যে বিকশিত হয়েছে বলাৎকার বা ধর্ষণ? প্যানোর্পার আচরণ দিয়ে আমরা মানুষের আচরণকে গ্রহণযোগ্য করতে পারি না।

তবে বহুপত্নীক বিবাহসংশ্রয়ে যেখানে পুরুষদের মধ্যে রয়েছে যৌন প্রতিযোগিতা, সেখানে বিবর্তনমূলক নির্বাচন কীভাবে কাজ করতে পারে, তা খুঁজে দেখতে পারি। বিয়ে করা তো আসলে কামপ্রতিযোগিতা। বহুপত্নীক বিবাহ এমন সংশ্রয়, যাতে কম সংখ্যক পুরুষ যৌন সম্পর্কে মিলিত হ'তে পারে বহুসংখ্যক নারীর সাথে। এ-পদ্ধতিতে পুরুষদের মধ্যে চলে সাফল্যের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা, কেননা সফল পুরুষেরাই শুধু লাভ করতে পারে কাম্য–সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী আবেদনময়ী–নারী। সফল পুরুষেরা আকর্ষণীয় নারীর কাছে। মানুষ প্রজাতির মধ্যে পুরুষের বহুপত্নীত্বের ব্যাপারটি অনেকটা বিবর্তনের ফলেই উদ্ভূত হয়েছে ব'লে অনেকে মনে করেন [দ্র থর্নহিল ও অন্যান্য (১৯৮৬, ১১০-১১১)]। অনেক সমাজে হারেমে বহুপত্নী রাখা অনুমোদিত। এমন সমাজে কিছু পুরুষ বহু নারীর সাথে মিলিত হয়, অধিকাংশ পুরুষ এক সময়ে এক নারীর সাথে মিলিত হয়, আর বহু পুরুষ কোনো নারীর সাথেই মিলনের সুযোগ পায় না। সব সমাজেই কমবেশি বহুপত্নীকতা রয়েছে। মানব সমাজের এ-বহুপত্নীকতা প্রত্যক্ষভাবে নারী লাভের জন্যে সৃষ্টি করে পুরুষের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা, আর পরোক্ষভাবে সৃষ্টি করে ধন ও মর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতা। ধন ও মর্যাদা পিতৃতন্ত্রের নারীর কাছে খুবই আকর্ষণীয়।

ধর্ষণ হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক বলপ্রয়োগে নারীসঙ্গম। বলপ্রয়োগে সঙ্গম হচ্ছে সে-সঙ্গম, যাতে নারীর স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন সম্মতি নেই। এতে সব সময় বলপ্রয়োগের দরকার পড়ে না। ধর্ষণ পুরুষের এমন আচরণ, যা নারীকে তার সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার দেয় না।

বিবর্তনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ষণ তখনই সংঘটিত হয়, যখন পুরুষ নারীর পছন্দকে বিপর্যস্ত ক'রে বলপ্রয়োগে তার সাথে সঙ্গম করে। এটা নারীর দুটি বিবর্তনমূলক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে : নারীর যৌনসঙ্গী বাছাইয়ের অধিকার নষ্ট করে, আর ধন ও মর্যাদার বিনিময়ে নিজের শরীর দানের অধিকারকে অস্বীকার করে। থর্নহিল ও অন্যান্য (১৯৮৬) সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে বিবর্তনের একটি পরিণতিরূপেই বিকাশ ঘটেছে ধর্ষণের। তাঁরা নারীবাদীদের ধর্ষণতত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁদের মতে পুরুষাধিপত্যই যদি থাকতো ধর্ষণের মূলে, তাহলে পুরুষ ক্ষমতাশালী বয়স্ক নারীদের ধর্ষণ করতো; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ধর্ষণকারীদের লক্ষ্য সাধারণত যুবতী ও দরিদ্র নারী। তাঁদের মতে নারীবাদীদের তত্ত্ব জ্ঞাপন করে যে সব শ্রেণী ও বয়সের পুরুষেরাই ধর্ষণকারী; তাও সত্য নয়; ধর্ষণকারীরা সাধারণত তরুণ ও দরিদ্র।

জীববিজ্ঞানীদের ধর্ষণতত্ত্বে বেশ সত্য রয়েছে, যাকে বলতে পারি জীবতাত্ত্বিক সত্য; নারীবাদীদের তত্ত্বে রয়েছে সামাজিকসাংস্কৃতিক সত্য, যা, বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে, জীববৈজ্ঞানিক সত্যের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জীববিজ্ঞানের সূত্রে দাবি করতে পারি যে হত্যা, স্বৈচারাচার, পীড়ন, লুণ্ঠন, শোষণ প্রভৃতি প্রবণতা উদ্ভূত হয়েছে বিবর্তনের ফলেই; তবে বিবর্তনের সূত্রের সাহায্যে সামাজিকরাজনীতিক অন্যায়কে বিধানসম্মত করা যায় না। মানুষ প্যানোর্পা নয়, মানুষ সামাজিকসাংস্কৃতিক প্রাণী; এবং মানুষের বর্তমান পর্যায়ে কেউ অন্য কারো ওপর আধিপত্য করার অধিকার রাখে না। পুরুষের ধর্ষণের প্রবণতা রয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই; না থাকলে পুরুষ ধর্ষণ করতো না; কিন্তু ধর্ষণে তাকে উৎসাহ দেয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। ধর্ষণরোধের উপায় হচ্ছে সমাজরাষ্ট্রের সব এলাকায় নারীর প্রতিষ্ঠা, পুরুষের সমান প্রতিষ্ঠা; তবে তাতেও হয়তো ধর্ষণ লুপ্ত হবে না। ধর্ষণ প্রতিরোধের জন্যে নারীকে হয়ে উঠতে হবে পুরুষের সমকক্ষ– ঘরে ও বাইরে, এবং শারীরিক শক্তিতে।